‘ঝড় বৃষ্টি আঁধার রাতে আমরা আছি তোমার সাথে’

বাংলাদেশের আলোকবর্তিকা

তোফায়েল আহমেদ

বাংলার গণমানুষের নন্দিতনেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আজ ৪১ বছর পূর্ণ হলো। ১৯৮১-এর ১৭ মে নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে স্বজন হারানোর বেদনা নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। যেদিন প্রিয়নেত্রী স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন সেদিন শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না, ছিল সর্বব্যাপী সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দুর্যোগ। স্বৈরশাসনের অন্ধকারে নিমজ্জিত স্বদেশে তিনি হয়ে ওঠেন আলোকবর্তিকা, অন্ধকারের অমানিশা দূর করে আলোর পথযাত্রী। দীর্ঘ ৪টি দশক অত্যাচার-অবিচার, জেল-জুলুম সহ্য করে, নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্ব দিয়ে, ৪ বার গণরায়ে অভিষিক্ত করে সরকার গঠন করে রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন তিনি। ’৭৫-এর পর আওয়ামী লীগ যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছিল, সেই দুঃসময়ে তিনি দলের হাল ধরেন। সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা তখন সামরিক শাসনের দুঃশাসনে নিপতিত। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ’৮১-এর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার উপর দলের নেতৃত্বভার অর্পণ করে তাঁর হাতে আমরা তুলে দিয়েছিলাম দলের রক্তেভেজা সংগ্রামী পতাকা। যেদিন তিনি প্রিয় মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন সেদিন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা মনে করেছিল শেখ হাসিনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকেই ফিরে পেয়েছে। ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী বিশ্বাসঘাতকের হস্তে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নির্মমভাবে নিহত হন। নিষ্পাপ শিশু রাসেলকে সেদিন হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা যদি সেদিন দেশের বাইরে না থাকতেন তারা আমাদের মধ্যে থাকতেন না। দীর্ঘ ২১ বছর পর ’৯৬ সনে তিনি রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পান। দৃঢ়তা ও সক্ষমতা নিয়ে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে সংবিধানকে কলঙ্কমুক্ত করে জাতির পিতার হত্যার বিচারের কাজ শুরু করেন। ২০০১-এ বিএনপি ক্ষমতায় এসে সেই বিচার বন্ধ করে। ২০০৮-এর নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে তিনি শুধু বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের কাজই সম্পন্ন করেননি, মানবতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ করে চলেছেন। সমগ্র বিশ্ব যখন করোনা মহামারিতে আজ বিপর্যস্ত, তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার দেশের মানুষের জন্য বিনামূল্যে টিকার ব্যবস্থা করেছেন। এই ক্রান্তিকালেও তিনি লক্ষাধিক গৃহহীন মানুষকে ঘর তৈরি করে দিয়েছেন। যা জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ তথা মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে গৃহহীনদের জন্য উপহার।

’৭৫-এর পর কঠিন সময় অতিক্রম করেছি আমরা। স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়ার নানারকম ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সফলভাবে কাউন্সিল অধিবেশন সম্পন্ন করার মাধ্যমে কায়েমীস্বার্থবাদী চক্রের ঘৃণিত চক্রান্ত আমরা ব্যর্থ করতে পেরেছিলাম। কাউন্সিল অধিবেশনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে সেদিন শেখ হাসিনা বার্তা প্রেরণ করে বলেছিলেন ‘আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এগিয়ে যান।’ বার্তাটি সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক সম্মেলনে পাঠ করেছিলেন। দলের শীর্ষ পদ গ্রহণে তাঁর সম্মতিসূচক মনোভাব সম্পর্কে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে বলেছিলাম, ‘আমরা সকলেই একটি সুসংবাদের অপেক্ষায় আছি।’ শেখ হাসিনা তার বার্তায় সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব বিভেদ ভুলে ‘আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির’ মাধ্যমে কাউন্সিলর ও নেতাদের বঙ্গবন্ধুর কর্মসূচি সোনার বাংলা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে গণবিরোধী স্বৈরশাসকের ভিতু কেঁপে উঠেছিল। দেশে ফেরার আগে স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়ার নির্দেশে ‘শেখ হাসিনা আগমন প্রতিরোধ কমিটি’ গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সজাগ থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম আমরা।

’৮১-এর ১৭ মে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ বৃষ্টিমুখর দিনে বিকাল সাড়ে ৪টায় তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন। সারাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে সেদিন বিমানবন্দরে সমবেত হয়েছিল। লাখো জনতা ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগানে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানিয়ে আরও স্লোগান তুলেছিল-‘শেখ হাসিনার আগমন শুভেচ্ছা-স্বাগতম’; ‘শেখ হাসিনা তোমায় কথা দিলাম, মুজিব হত্যার বদলা নেবো’; ‘ঝড়-বৃষ্টি আঁধার রাতে, আমরা আছি তোমার সাথে’; ‘বঙ্গবন্ধুর রক্ত বৃথা যেতে দেবো না’; ‘আদর্শের মৃত্যু নেই, হত্যাকারীর রেহাই নেই’। বিমান বন্দর থেকে প্রিয়নেত্রীকে নিয়ে যখন মানিক মিয়া এভিনিউতে যাই রাস্তার দু’পাশে লক্ষ লক্ষ লোক। এমন দৃশ্য যা বর্ণনাতীত। সভামঞ্চে উঠে ক্রন্দনরত অবস্থায় সেদিন তিনি বলেছিলেন, ‘আমি সর্বহারা। আমার কেউ নেই। আপনাদের মাঝেই আমার হারানো পিতামাতা, আমার ভাই, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে আমি খুঁজে পেতে চাই। আপনাদেরকে কথা দিলাম এই দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আমি জীবন উৎসর্গ করবো।’ মানিকমিয়া এভিনিউর জনসমুদ্রে সর্বস্তরের জনতার উদ্দেশে বক্তৃতায় জাতির কাছে যে অঙ্গীকার তিনি ব্যক্ত করেছিলেন পরবর্তীতে সে-সব প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করে আজও তা অব্যাহত রেখেছেন।

দেশে ফেরার পর তার নেতৃত্বে সামরিক শাসন বিরোধী দুর্বার গণআন্দোলন সংগঠিত হয়। তৎকালীন সামরিক শাসকের নির্দেশে ’৮৩-এর ফেব্রুয়ারিতে তাকেসহ আমাদের সামরিক গোয়েন্দারা চোখ বেঁধে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এবং বিনা কারণে একটানা ১৫ দিন আটকে রাখে। ’৮৪-এর ফেব্রুয়ারি ও নভেম্বরে তাকে পুনরায় গৃহবন্দি করা হয়। ’৮৫-এর মার্চে তাকে ৩ মাস এবং আমাকে ৬ মাস বিনাবিচারে আটক রাখে। জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকা সত্ত্বেও ’৮৬-এর ১০ নভেম্বর তিনি যখন সচিবালয় অবরোধ কর্মসূচির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তখন পুলিশ তার প্রতি গুলিবর্ষণ করে এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গাড়িতে উপবিষ্ট থাকা

অবস্থায় তার গাড়ি ক্রেন দিয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করে। পরদিন ১১ নভেম্বর তার বিরুদ্ধে ১ মাসের আটকাদেশ দেওয়া হয়। '৮৮-এর ২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রামে তাকে হত্যার উদ্দেশে তার গাড়ি বহরে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। সেদিন বঙ্গবন্ধু কন্যাকে রক্ষায় প্রায় অর্ধশত নেতাকর্মী প্রাণ বিসর্জন দেন। '৯০-এর ২৭ নভেম্বর স্বৈরাচার কর্তৃক জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর শেখ হাসিনাকে বঙ্গবন্ধু ভবনে অন্তরীণ করা হয়। প্রবল গণরোষের ভয়ে সামরিক সরকার ঐদিনই তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। '৯৪-এ তাঁর আহ্বানে ট্রেনমার্চের সময় ঈশ্বরদী রেল স্টেশনের উত্তরপ্রান্তে বন্দুকধারীরা তাঁর কামরা লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। সেদিনও তিনি সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারিতে পিলখানা হত্যাযজ্ঞের পর ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন ও নিউইয়র্ক টাইমসের ১৪-১৫ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমি থামবো না, এসব ষড়যন্ত্র উদঘাটন করতেই হবে। আমি নিজের জীবনের জন্য ভীত হয়ে পড়লে গোটা জাতি ভীত হয়ে পড়বে। আমি জানি, কিছু বুলেট আমায় তাড়া করছে।' সত্যিই ঘাতকের চোখ শেখ হাসিনার ওপর থেকে সরে যায়নি। ঘাতকের সর্বশেষ নিষ্ঠুর আঘাত এসেছিল ২০০৪-এর ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মধ্য দিয়ে। সেদিন নেত্রী প্রাণে বেঁচে গেলেও জীবন দিতে হয়েছে আইভি রহমানসহ আওয়ামী লীগের ২৪ জন নেতাকর্মীকে। শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশে সর্বমোট ২১ বার হামলা হয়েছে। অকুতোভয় শেখ হাসিনার বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আমাদের মহান নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতোই অসীম সাহসী, চিত্ত তার ভয় শূন্য!

জাতির পিতা দু'টি লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। একটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, আরেকটি অর্থনৈতিক মুক্তি। তিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, অর্থনৈতিক মুক্তি দিয়ে যেতে পারেননি। অর্থনৈতিক মুক্তির সেই অসমাপ্ত কাজটি দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। '৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক বিশ্বে মর্যাদার আসনে আসীন করেছেন। শেখ হাসিনার শাসনামলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ঠ পর্যালোচনা করলে দেখবো, বিস্ময়কর উত্থান বাংলাদেশের। 'বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আমরা ৫৭-তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হয়েছি। এই একটি কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সুনাম অনন্য উচ্চতায় উঠেছে। 'নিউক্লিয়ার নেশন' হিসেবে আমরা বিশ্ব পরমাণু ক্লাবের সদস্য হয়েছি। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হতে জাতিসংঘের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যেসব শর্তসমূহ রয়েছে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তা পূরণ করে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে প্রবেশ করেছে। পদ্মা সেতুতে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন বন্ধ করার পরেও দৃঢ়তার সাথে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ শুরু করে আজ তা সমাপ্ত। সবল-সমর্থ আর্থসামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বাংলাদেশ আজ বিশে^র শীর্ষ ৫টি দেশের একটি। সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের কৃতিত্বের জন্য জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ পর্যন্ত বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করেছে।

মানবসূচক উন্নয়নে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিস্মিত জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, 'অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশের উচিত বাংলাদেশকে অনুসরণ করা।' প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত বছরগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং মাথাপিছু আয় যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই হার অব্যাহত থাকলে সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, '২০৪১-এর মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে উন্নীত হবে।' শিক্ষার হার বেড়েছে, দারিদ্র্যের হার কমেছে, শিল্প ও কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত গ্রামগুলো শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রিয় মাতৃভূমির স্বার্থকে সমুন্নত রাখতে শেখ হাসিনা অঙ্গীকার করেছিলেন, '৫০ বছরের গ্যাসের মজুদ না রেখে আমি গ্যাস রফতানি করবো না।' সেই অঙ্গীকার তিনি সমুন্নত রেখেছেন এবং দেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতকে শক্তিশালী করতে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। '৯৬-এ তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব লাভের পর পার্বত্য শান্তি চুক্তি করেছেন। '৯৮-এর বন্যায় ভিজিএফ কার্ড প্রবর্তনের মাধ্যমে বন্যার্ত প্রায় ৩ কোটি মানুষকে নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্য সরবরাহ করেছেন। যা এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। ফারাক্কার পানি বণ্টনে বঙ্গবন্ধু সরকার শুষ্ক মৌসুমে পেয়েছিল ৪৪ হাজার কিউসেক পানির নিশ্চয়তা। পানি সমস্যার সমাধানে তিনি ঐতিহাসিক গঙ্গা চুক্তি করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী পাওয়ার কথা ৩৪,০০০ হাজার কিউসেক, অথচ তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে শুষ্ক মৌসুমে ৬৪ হাজার কিউসেক পর্যন্ত পানি পাওয়া গেছে। '৯৬-এ আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে তখন দেশের খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪০ লাখ মেট্রিক টন। সেই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে বাংলাদেশকে তিনি উন্নীত করেছেন খাদ্য রপ্তানিকারক দেশে। পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তি দূর করে ঐতিহাসিক 'শান্তি চুক্তি' সম্পাদন করেছেন। ২০১৪-এর ৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো প্রধান ইরিনা বোকোভা শেখ হাসিনার হাতে 'শান্তি বৃক্ষ' পদক তুলে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'সাহসী নারী শেখ হাসিনা সারা পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছেন।' দারিদ্র্যমোচন, শান্তি স্থাপন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সুশাসন, মানবাধিকার রক্ষা, আঞ্চলিক শান্তি, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যখাতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারী ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার প্রশংসনীয় অবদান বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৫-এর ২৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭০-তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দি আর্থ' প্রদান করা হয় তাঁকে। নির্যাতিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সারা বিশ্বে তিনি পরিচিত হয়েছেন 'মাদার অব হিউম্যানিটি' উপাধিতে। বিশ্বের খ্যাতনামা বিভিন্ন বিদ্যাপীঠ তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছে।

২০০৮-এর নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ হাসিনা ভারতের সাথে সীমান্ত চুক্তি ও সমুদ্র সীমা নির্ধারণ চুক্তি করেন। তার নেতৃত্বে দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে অতিকায় সব মেগা প্রোজেক্ট। পদ্মা রেল সেতু সংযোগ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রোজেক্ট, মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রোজেক্ট, মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল,

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প তথা মেট্রো রেল, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর এবং দোহাজারী থেকে ঘুমধুম পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের উদ্যোগ, এসবই তাঁর নেতৃত্বে যুগান্তকারী কাজ। বিদ্যুৎ উৎপাদনে তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন। পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া বিদ্যুতের বিপুল ঘাটতি সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে জনজীবন থেকে লোডশেডিং দূর করেছেন। দেশে বিদ্যুতের ইনস্টলড ক্যাপাসিটি এখন ২৫,৫১৪ মেগাওয়াট। বিগত বছরে রাজধানী ঢাকার উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন। ফলে ঢাকার চেহারাই পাল্টে গিয়েছে। নয়নাভিরাম হাতিরঝিল প্রকল্প, চলাচলের সুবিধার জন্য নিত্য-নতুন ফ্লাইওভার তার অবদান। দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সুবিধা ভোগ করতে শুরু করেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। পদ্মা সেতু আগামী মাসে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে। ঢাকা শহর যানজট মুক্ত করতে মেট্রোরেলের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রোরেল চালু হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশে^ উন্নয়নের রোল মডেল। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে এগিয়ে।

সামাজিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ আমরা এগিয়ে চলেছি। তিনি নিয়মিত পড়াশোনা করেন। ক্যাবিনেট মিটিংগুলোতে যথাযথ হোমওয়ার্ক করে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে মিটিংয়ে আসেন। একনেক বা ক্যাবিনেট মিটিংয়ের দু'একদিন আগেই মিটিংয়ের আলোচ্যসূচি, প্রস্তাবাবলি ফাইলে দেওয়া হয়। যখন একটি বিষয় প্রস্তাব আকারে পেশ করা হয়, তখন সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়গুলো তিনি সভায় সবিস্তারে তুলে ধরেন এবং সঠিকভাবে প্রতিটি প্রস্তাবের উপরে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর এই অবাক করা প্রস্তুতি সকলকে মুগ্ধ করে। সারাদিন তিনি কাজ করেন। ভীষণ পরিশ্রমী, হাস্যোজ্জ্বল এবং আবেগময়ী মানুষ তিনি। ধর্মপ্রাণ হিসেবে প্রতি প্রত্যুষে তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাজ আদায় করে তবেই তিনি দিনের কাজ শুরু করেন। পিতার মতোই গরিবের প্রতি তাঁর দরদ অপরসীম। বঙ্গবন্ধুর ফান্ড আমার কাছে থাকতো। তিনি গরিব-দুখী মানুষকে অকাতরে সাহায্য করতেন। আমাকে নির্দেশ দিতেন তাদের সাহায্য করো। জাতির পিতার কন্যার কাছে গরিব-দুখী মানুষ যখন হাত পাতে পিতার মতো তিনিও তাদের সাহায্য করেন। আমাদের দেশে যারা বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সমাজসেবক তাদের বিপদআপদে পাশে দাঁড়ান। একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা শেখ হাসিনা একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক। পিতা-মাতার মতো সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত সংস্কৃতবান এবং খাঁটি বাঙালি নারী তিনি। বাংলার মানুষের প্রতি তার দরদ এবং মমত্ববোধ, তার জ্যোতির্ময় পিতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চেতনা থেকে আহরিত। তবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেবে পরিচিত; বরং আপন যোগ্যতায় স্ব-মহিমায় বাংলার কোটি মানুষের হৃদয়ে তিনি অধিষ্ঠিত। শুধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রনায়ক না, আন্তর্জাতিক নেতা হিসেবে ইতোমধ্যে বিশ্বজনমত ও নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে তিনি সক্ষম হয়েছেন।

একটা কথা মাঝে মাঝে মনে হয়, সেদিন শেখ হাসিনার হাতে যদি আওয়ামী লীগের পতাকা তুলে দেওয়া না হতো তাহলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলার মাটিতে হতো না। যেখানে বেগম খালেদা জিয়া যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধী অপরাধীদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতিকে কলঙ্কিত করেছিলেন, সেখানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে বাংলার মানুষকে কলঙ্কমুক্ত করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই পালন করতেন; একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার সাথে আপোশ করতেন না এবং ফাঁসির মঞ্চে গিয়েও মাথা নত করতেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও জাতির পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সেই আদর্শ অর্জন করেছেন। তিনিও লক্ষ্য নির্ধারণ করে কাজ করেন এবং সেই লক্ষ্য পূরণে থাকেন অবিচল। আজ ভাবতে কতো ভালো লাগে, সেদিন বঙ্গবন্ধুর রক্তেভেজা আওয়ামী লীগের পতাকা শেখ হাসিনার হাতে তুলে দিয়ে আমরা যে সঠিক কাজটিই করেছিলাম তা প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে আলোকিত করে চলেছেন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা।

#

লেখকঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

১৭.০৫.২০২২ পিআইডি ফিচার